Belles-Lettre
A peer-reviewed journal of multidiscipline & multi language

ISSN: 3107-9814 (Online)
Volume: 3, Issue: 1 || February 2026 || PP. 103-107 https://belles-lettre.in/Pdf/Jahan

# শরৎ-সাহিত্যে মার্কসবাদী বস্তুবাদ: শ্রেণি-সংগ্রাম ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার এক অনন্য দলিল

**নাসরিন আক্তার জাহান**

স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পি. জি. ডিপ্লোমা, মানবাধিকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Email: nasrinaktarjahan99@gmail.com

**সংক্ষিপ্তসার:** এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে মার্কসবাদী বস্তুবাদের (Marxist Materialism) প্রতিফলিত রূপটি অনুসন্ধান করা। প্রথাগতভাবে শরৎচন্দ্রকে 'মরমী কথাসাহিত্যিক' হিসেবে গণ্য করা হলেও, তাঁর রচনার গভীরে যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব, শ্রেণি-শোষণ এবং ক্ষমতার বিন্যাস কাজ করে, তা মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের অত্যন্ত নিকটবর্তী। বিশেষত, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অন্তিম দশা এবং নব্য-পুঁজিবাদের বিকাশের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র কীভাবে ব্রাত্য ও শোষিত মানুষের 'শ্রেণি-চেতনা' (Class Consciousness) এবং 'বিচ্ছিন্নতাকে' (Alienation) ফুটিয়ে তুলেছেন, তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**মূলশব্দ:** সর্বহারা চেতনা, শ্রেণি বৈষম্য, উৎপাদন সম্পর্ক, গ্রামীণ অর্থনীতি, পিতৃতন্ত্র, সম্পত্তির অধিকার, এলিয়েনেশন।

**মূল প্রবন্ধ:** কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তাঁদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদে দেখিয়েছেন যে, সমাজের 'ভিত্তি' (Base) হলো তার অর্থনৈতিক কাঠামো, আর সেই কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সংস্কৃতি, আইন এবং সাহিত্যের মতো 'উপরিস্তর' (Superstructure)। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য এই তত্ত্বের এক জীবন্ত উদাহরণ। শরৎচন্দ্র যখন লিখছেন, তখন বাংলার গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এক নিদারুণ বৈষম্য তৈরি হয়েছে। তিনি তাঁর চারপাশের মানুষকে কেবল ভাবাবেগ দিয়ে দেখেননি, দেখেছেন তাদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা দিয়ে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে মানুষের নৈতিক অধঃপতন বা উত্তরণ—সবই শেষ পর্যন্ত তার বস্তুগত অবস্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

কার্ল মার্কস তাঁর 'A Contribution to the Critique of Political Economy' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন— "মানুষের অস্তিত্ব তার চেতনা নির্ধারণ করে না, বরং তার সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে।" শরৎচন্দ্র যখন তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন, তখন বাংলার গ্রামগঞ্জে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ছত্রছায়ায় সামন্ততন্ত্র এক কুৎসিত রূপ ধারণ করেছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য কেবল মধ্যবিত্তের প্রেমের কাহিনী নয়, বরং তা এই অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এক নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

শরৎচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যে দারিদ্র্য এবং সমাজচ্যুতির স্বাদ পেয়েছিলেন, তা-ই তাঁকে জীবনের 'বস্তুবাদী' রূপ দেখতে সাহায্য করেছে। তিনি রোমান্টিক কল্পনার আড়ালে মানুষের হাড়-মাংসের লড়াইকে কখনও আড়াল করেননি। তাঁর সাহিত্যে অভাব কেবল একটি অবস্থা নয়, অভাব হলো একটি 'শ্রেণিগত' চরিত্র।এখন আমরা আলোচনা করবো শরৎ চন্দ্রের রচনাতে মার্কসীয় বস্তুবাদ এর প্রভাব কতটা।

মার্কসবাদী দর্শনে 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' (Dialectical Materialism) অনুযায়ী, সমাজের অগ্রগতি ঘটে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। দ্বন্দ্বের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ' পল্লীসমাজ ' উপন্যাস এর কথা। যেখানে এই দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রকট। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পগুলো মার্কসবাদী 'ইকোনমিক ডিটারমিনিজম'-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এখানে চরিত্রদের ভাগ্য কোনো দৈব বিধান নয়, বরং পুঁজি ও জমির মালিকানা দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। শুধু তাই নয় এই উপন্যাসে উৎপাদন সম্পর্কের সংঘাত এর চিত্র ফুটে উঠেছে।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে আমরা দেখি জমিদার বেণী ঘোষাল এবং সংস্কারমুক্ত রমেশের সংঘাত। বেণী ঘোষাল এখানে শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি, যার কাছে মুনাফাই শেষ কথা। অন্যদিকে রমেশের চরিত্রটি এক ধরনের প্রগতিশীল বুর্জোয়া বা সমাজতন্ত্রী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। বাঁধ কাটার ঘটনাটি এখানে একটি অর্থনৈতিক সংঘাত— একদিকে শোষকের মাছ চাষের ব্যক্তিগত মুনাফা, অন্যদিকে সাধারণ কৃষকদের ফসল রক্ষার সামষ্টিক স্বার্থ। শরৎচন্দ্র এখানে দেখিয়েছেন যে, আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোভ কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে দেয়। শুধু তাই নয় , ধর্মের আফিম ও সামাজিক আধিপত্য এর ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর রচনাতে।

মার্কস বলেছিলেন, ধর্ম হলো শোষিত মানুষের আর্তনাদ এবং শোষকের হাতের 'আফিম'। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে সমাজপতিরা (যেমন ধর্মদাস বা গোবিন্দ চাটুজ্যে) ধর্মকে ব্যবহার করে গরিব মানুষের কণ্ঠরোধ করার জন্য। 'পল্লীসমাজ'-এ দেখা যায়, যখনই কেউ সাম্য বা ন্যায়ের কথা বলতে যায়, তখনই তাকে 'একঘরে' করা বা ধর্মের দোহাই দিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। এটি মার্কসীয় তত্ত্বের 'আদর্শগত রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের' (Ideological State Apparatus) এক গ্রামীণ রূপ। রমেশ ও বেণী ঘোষালের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন কীভাবে উচ্চবিত্তরা ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার করে। যেমন –

"ধর্ম! ধর্ম কেবল মুখে বলিলে হয় না রমেশ, ধর্ম পালন করিতে হয়। গ্রামের বারোয়ারি পুজো আটকাইয়া তুমি অধর্ম করিতেছ"। (বেণী ঘোষাল যখন নিজের মাছের ব্যবসার স্বার্থে সাধারণ মানুষের ফসল ডোবাতে চায় এবং তাকে ধর্মের দোহাই দিয়ে বৈধতা দেয়)

"সমাজ তো শুধু শাসন করবার জন্য নয় রমেশ, সমাজ দয়া করবার জন্য, সেবা করবার জন্য"। (রমেশের এই উক্তিটি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের সেই কল্যাণকামী রূপের ইঙ্গিত দেয়)। মার্কসীয় সংজ্ঞায় 'প্রোলেতারিয়েত' হলো সেই শ্রেণি, যাদের উৎপাদন যন্ত্রের ওপর কোনো অধিকার নেই।

'মহেশ' গল্পের গফুর জোলা কেবল একজন অভাবী মানুষ নয়, সে মার্কসীয় তত্ত্বের সেই 'প্রলেতারিয়েত' বা সর্বহারা, যার উৎপাদিত ফসলের ওপর তার নিজের অধিকার নেই। যেখানে জমিদারের প্রতিনিধিত্ব দেখা যায় সচেতন ভাবেই। জমিদার ও তার আমলা শিবচরণ বাবু এখানে শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। গফুরের একমাত্র সম্বল তার বলদ মহেশকে ধর্মের নামে বলি দেওয়ার যে হুমকি বা চাপ, তা আসলে অর্থনৈতিক শোষণের একটি কৌশল।আবার অন্যদিকে দেখি

'মহেশ' গল্পের গফুর জোলা যখন তার নিজের জমি, গ্রাম থেকে বিচ্যুত, তখন তার প্রিয় বলদটি তার কাছে কেবল একটি পশু নয়, তার উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি অংশ। কিন্তু জমিদারের খাজনার চাপে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে যখন সে সব হারায়, তখন সে উন্মাদ হয়ে পড়ে। তখন সে গ্রামীণ কৃষি-ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরের 'শিল্প-শ্রমিক' (Industrial Labour) হিসেবে রূপান্তরিত হয়। মার্কসের ভাষায় এটিই হলো মানুষের তার পরিবেশ এবং সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। যাকে বলি বিচ্ছিন্নতাবাদ বা এলিয়েনেশন।

গফুরের এই আর্তনাদগুলো সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে এক চরম প্রতিবাদ। গফুর যখন জমিদারের তৈরী কৃত্রিম সংকটের শিকার হয় তখন তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়-

"আল্লা, আমাকে যত খুশি সাজা দিও, কিন্তু মহেশ আমার তৃষ্ণা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার মাঠ তুমি রাখোনি—যে তোমার দেওয়া ঘাস, তোমার দেওয়া জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাফ করো না।

শরৎ চন্দ্রের রচনা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে বলতেই হয় শ্রেনী বৈষম্যের কথা। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শ্রেনী বৈষম্য। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি এক রূঢ় বস্তুবাদী দলিল। এখানে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তি বা সৎকারের অধিকারও মানুষের অর্থনৈতিক শ্রেণি দ্বারা নির্ধারিত হয়। বামুন-মায়ের সৎকার যখন চন্দন কাষ্ঠে হয়, তখন কাঙালীর মা অভাগীর মরা পোড়ানোর জন্য সামান্য খড়ও জোটে না। এই বৈষম্য কোনো দৈব বিধান নয়, এটি নিছকই একটি 'শ্রেণি-ব্যবস্থা'।

অভাগীর সৎকার না হওয়াটা কি কেবল জাতপাতের সমস্যা? মার্কসবাদী দৃষ্টিতে এটি একটি অর্থনৈতিক সমস্যা। সামন্ততান্ত্রিক

সমাজে নিম্নবর্গের মানুষের হাতে কোনো উদ্বৃত্ত সম্পদ থাকে না। অভাগীর পুত্র কাঙালী যখন কাঠের জন্য দ্বারে ঘোরে, তখন বোঝা যায় যে 'স্বর্গ' বা 'ধর্মীয় রীতি'—সবই উচ্চবর্গের বিলাসবহুল অধিকার। দারিদ্র্য এখানে মানুষের শেষযাত্রাকেও বাধাগ্রস্ত করে। এই ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ধর্ম কিভাবে মানুষকে বিভাজন করে যেখানে একটা মানুষের মৃত্যুর পরও একটা হাহাকার দৃশ্য রূপ নেয় যা মূলত শ্রেনী বৈষম্যের রুপ। অন্যদিকে নারী মুক্তি ও সম্পত্তির অধিকারর্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গ উঠে আসে। এঙ্গেলস তাঁর 'The Origin of the Family, Private Property and the State' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে নারীর পরাধীনতা শুরু হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে নারীর এই পণ্য হয়ে ওঠাকে যেন চ্যালেঞ্জ করেছেন। যেমন - শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে প্রগতিশীল চরিত্র হলো অভয়া। সে যখন তার অত্যাচারী স্বামী ত্যাগ করে অন্য পুরুষের সঙ্গে সংসার করে, তখন সে আসলে পিতৃতান্ত্রিক 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়। তখন সে আসলে পিতৃতান্ত্রিক সম্পত্তির অধিকার এবং নৈতিকতাকে অস্বীকার করে। এটি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর স্বাধিকার আন্দোলনের এক আদিম রূপ। এঙ্গেলস তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছিলেন যে, নারী-পুরুষের অসমতার মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকার রক্ষা। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে এই সত্যটি উন্মোচন করেছেন।

আবার শরৎচন্দ্র পণ্য হিসেবেও নারী দেখিয়েছেন। যেমন শ্রীকান্ত' উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী বা 'দেবদাস'-এর চন্দ্রমুখী—এরা সকলেই কোনো না কোনোভাবে বাজার-অর্থনীতির শিকার। সমাজ তাদের ব্রাত্য করেছে কারণ তারা পরিবারের সম্পত্তির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েনি। এছাড়াও দেখি রাজলক্ষী ও সাবিত্রী তারা দুজনেই সমাজ থেকে বিচ্যুত। রাজলক্ষীর প্রেম শ্রী কান্তের প্রতি থাকলেও, সে বারবার তার অর্থ এবং সামাজিক মর্যাদাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। কারণ সে জানে, এই বস্তুবাদী পৃথিবীতে অর্থহীন নারী কেবল ভোগের সামগ্রী।

নারীর অবস্থান যে শেষ পর্যন্ত পুরুষের তৈরি সমাজ ও অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল, তা এই উক্তিগুলোতে স্পষ্ট।যখন অভয়ার মুখ থেকে বলতে শুনি – "সমাজ! সমাজ ত কেবল আমাদের মতন দুর্বলদের শাসন করিবার জন্যই তৈরি হইয়াছে"। এই উক্তির মধ্যে দিয়ে অভয়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর অসাম্যকে তুলে ধরেছে)। এছাড়াও 'পথের দাবী' উপন্যাসটি রাজনৈতিক অর্থনীতির ছবি ধরা পড়েছে।

শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাসটি সরাসরি রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা বলে। সব্যসাচী চরিত্রটি কেবল একজন সন্ত্রাসবাদী নয়, সাধারন কোনো দেশপ্রেমিক নয়, সে একজন আন্তর্জাতিক বিপ্লবী। একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'তে মার্কসীয় বিপ্লবী চেতনার আভাস পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে বর্মার চটকল ও কারখানার শ্রমিকদের যে ঐক্য ও বিদ্রোহ দেখানো হয়েছে, তা সরাসরি 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র সেই ডাককে স্মরণ করিয়ে দেয়— "দুনিয়ার মজদুর একে হও"। উপন্যাসে বর্মার চটকলের শ্রমিকদের ধর্মঘট ও তাদের মানবেতর জীবন যাপনের চিত্রটি সরাসরি 'শ্রেণি সংগ্রাম' (Class Struggle)-কে তুলে ধরে। সব্যসাচী মনে করে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ততক্ষণ অর্থহীন, যতক্ষণ না অর্থনৈতিক মুক্তি আসছে। সব্যসাচীর কথা বলতে গেলে আন্তর্জাতিকতাবাদ বা internationalism প্রসঙ্গ উঠে আসে। মার্কস যেমন বলেছিলেন, 'শ্রমিকদের কোনো দেশ নেই', সব্যসাচীর চরিত্রেও সেই আন্তর্জাতিক বিপ্লবী চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কেননা, সব্যসাচী কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ দেশপ্রেমিক নন। তিনি রেঙ্গুন, জাভা, সুমাত্রা থেকে শুরু করে হংকং পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে। বর্মার চটকল ও রেল-কারখানার শ্রমিকদের দুরবস্থা দেখে সব্যসাচী বুঝেছিলেন যে, শোষক শ্রেণির কোনো দেশ নেই, তারা সর্বত্র সমান। তাই শোষিতের মুক্তিও হতে হবে বিশ্বব্যাপী। উপন্যাসে সব্যসাচীর উক্তিগুলো সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যেন এক লড়াইয়ের মন্ত্র। যেমন – "দেশের স্বাধীনতা বড়ো নয় সব্যসাচী, মানুষের মুক্তিই সব চেয়ে বড়ো"। (এখানে 'মানুষের মুক্তি' বলতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খল ভাঙার কথা বলা হয়েছে)। আবার কোথাও বলেছেন – "ক্ষুধা যাদের প্রতিদিনের সাথী, তাদের কাছে দেশপ্রেমের বক্তৃতা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র"। (এটি একটি খাঁটি বস্তুবাদী উক্তি—যেখানে বলা হচ্ছে পেটে অন্ন না থাকলে আদর্শবাদ অর্থহীন) যা মূলত মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান চাই তা আমাদের মনে করে দেয়। কোথাও খাদ্য কোথাও বা বস্ত্র নিয়ে স্পষ্ট বলেছেন –

"যাঁহারা অন্ন যোগায়, যাঁহারা কাপড় বুনে, তাঁহারাই ত দেশের আসল মালিক। এই মালিকানা স্বত্ব যাহাতে ফেরে, 'পথের দাবী'র কাজ ত তাহাই"। (এটি সরাসরি প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণির অধিকারের কথা বলে)।

শরৎ-সাহিত্যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব (Economic Conflict) অন্যতম একটি আলোচনার বিষয় । যেখানে কেবল দারিদ্র্যের বর্ণনা নয়, বরং এটি শোষক ও শোষিতের মধ্যকার ক্ষমতার এক লড়াই। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে এই দ্বন্দ্বই সমাজের চালিকাশক্তি। সেই দ্বন্দ্ব বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রচনায় ধরা পড়েছে । যেমন - 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মধ্যবিত্তের মনস্তত্ত্বে অর্থের প্রভাব লক্ষ্যনীয়। অনেকে 'গৃহদাহ'-কে কেবল ত্রিভুজ প্রেমের গল্প মনে করেন, কিন্তু এর গভীরে রয়েছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হীনতার দ্বন্দ্ব। মহিম , অচলা ও সুরেশের মধ্যে মনের টানাপোড়েন ছিল না, মূলেই ছিল অর্থনৈতিক টানাপোড়েন। মহিম দরিদ্র কিন্তু আদর্শবান, অন্যদিকে সুরেশ অত্যন্ত বিত্তবান। অচলার দ্বিধা কেবল চারিত্রিক নয়, বরং তার অবচেতনে কাজ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মোহ।

মার্কসবাদের মতে, মানুষের ভালোবাসা বা আবেগও অনেক সময় তার আর্থিক সংগতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুরেশের অঢেল ঐশ্বর্য অচলার জীবনে এক ধরনের 'বস্তুগত নিরাপত্তা'র প্রলোভন তৈরি করে। ফলে দ্বন্দ্বের রূপ তীব্রতর হয়। মহিমের দারিদ্র্য অচলার জীবনে যে কৃচ্ছ্রসাধন আনে, সুরেশের সম্পদ সেখানে বিলাসিতা আনে। এই যে প্রাচুর্য ও অভাবের সংঘাত, তা-ই অচলার জীবনের ট্র্যাজেডিকে ত্বরান্বিত করে। শরৎচন্দ্র এখানে দেখিয়েছেন, চরম দারিদ্র্য বা চরম সম্পদ—উভয়ই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও নৈতিকতাকে কীভাবে ধ্বংস করতে পারে। অন্যদিকে 'দত্তা উপন্যাসে ভূসম্পত্তি ও বিবাহিক কূটনীতির প্রসঙ্গ এসেছে। 'দত্তা' উপন্যাসে প্রেম নয়, বরং কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জমিদার ও উইল (Will)। যেখানে আমরা দেখি বিজয়া, বিলাস এবং নরেনের সম্পর্কের আবর্তে রয়েছে জগদীশ ও বনমালীর রেখে যাওয়া ভূসম্পত্তি। বিলাস বিহারী ও তার পিতা রাসবিহারী বিজয়াকে ভালোবাসে না, তারা ভালোবাসে বিজয়ার 'সম্পত্তি'কে।

এখানে বিবাহ কোনো ভালোবাসার টানে নয় বরং এটি একটি অর্থনৈতিক চুক্তি (Economic Contract) হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসবিহারী চরিত্রটি মার্কসীয় দর্শনের সেই ধূর্ত মধ্যস্বত্বভোগী, যে ধর্মের দোহাই দিয়ে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করতে চায়। নরেন এখানে সেই সর্বহারা বুদ্ধিজীবী, যার বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকলেও হাতে মূলধন নেই। যার ফলে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় ।আমরা দেখি, যখন নরেনের বাড়ি নিলাম হওয়ার উপক্রম হয়, তখন বোঝা যায় যে আইন ও সমাজ সব সময় ধনীর পক্ষে থাকে, নামমাত্র শুধু আইন বা বলতে পারি সংবিধান এর কথা। কিন্তু আইনের নির্মম ফাঁদের কাছে, সম্পত্তির কাছে হেরে যায় পবিত্র সম্পর্ক । আসলে টাকার হিসেব মিললেও সম্পর্কের হিসেব যে মেলে না । শরৎচন্দ্র খুব সচেতন ভাবেই এখানে দেখিয়েছেন যে, হৃদয়ের সম্পর্কও কীভাবে আইনি দলিলে বা টাকার অঙ্কে বন্দি হয়ে পড়ে।

**উপসংহার:** পরিশেষে বলা যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কার্ল মার্কসের গ্রন্থ পাঠ করে সাহিত্যচর্চা করেননি, কিন্তু তাঁর গভীর জীবনবোধ তাঁকে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদে'র কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। তিনি জীবন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মানবতাবাদী হয়ে উঠেছিল । তবে সেই মানবতাবাদের মূলে ছিল মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের হাহাকার এবং উচ্চবর্গের শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা—যা মার্কসীয় বস্তুবাদেরই এক শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ। তাঁর সাহিত্যে শোষিত মানুষ কেবল দয়ার পাত্র নয়, বরং তাঁরা সমাজের সেই শক্তি যারা দীর্ঘস্থায়ী অবিচারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে শিখেছে। তিনি সমাজের 'উপরিস্তর' (সংস্কৃতি ও ধর্ম) ভেদ করে তার 'ভিত্তি' (অর্থনীতি)-কে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর সাহিত্য কেবল কান্নার আকর নয়, বরং তা শোষিত মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর এক ধ্রুপদী দলিল। বর্তমান পুঁজিবাদের যুগেও গফুর বা অভাগীদের অস্তিত্ব বিলীন হয়নি, তাই শরৎচন্দ্রের বস্তুবাদী পাঠ আজও প্রাসঙ্গিক।

**গ্রন্থপঞ্জি:**

১. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র – শরৎ রচনাবলী।

২. ঘোষ, বিনয় – বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা।

৩. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ – শরৎচন্দ্রের রাজনীতক. মূল উৎস (Primary Sources):

৪. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

৫. মার্কসবাদী তত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্ব (Theoretical Sources):

৬. মার্কস, কার্ল। পলিটিক্যাল ইকোনমি (A Contribution to the Critique of Political Economy)। (বাংলা অনুবাদ: প্রগতি প্রকাশন)।

৭. এঙ্গেলস, ফ্রিডরিখ। পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা।

## ইংরেজী গ্রন্থপঞ্জি:

1. Marks, Karl – Capital (volume 1)

2. Marks Karl, Engels Friedrich – The communist Manifesto.